ছন্দ ও অলঙ্কার

ছন্দের পারিভাষিক শব্দ ১

সংজ্ঞা ঃ শিল্পিত বাকরীতির নামই ছন্দ।—প্রবোধচন্দ্র সেন।

বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজালে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তার মধ্যে ভাবগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাবার সে পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

যেভাবে পদবিন্যাস করলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয় তাকে ছন্দ বলে।

—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

অক্ষর ঃ বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তার নাম অক্ষর। অক্ষরকে ইংরেজিতে Syllable(সিলেবল) বলা হয়। যেমন ঃ অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি সব স্বরবর্ণ এবং কা, কাক, মন ইত্যাদি একক হিসেবে উচ্চারিত স্বরব্যঞ্জন যুক্ত ধ্বনিসমূহ।

অক্ষর দু ধরনের। ১. স্বরান্ত অক্ষর ও ২. ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

স্বরান্ত অক্ষর ঃ যে সব অক্ষর স্বরধ্বনিজাত অথবা অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি আছে তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন ঃ অ, আ, রা (রা+আ), মু (ম+উ) ইত্যাদি।

স্বরান্ত অক্ষরকে বিবৃত বা মুক্তাক্ষর বা Open Syllable বলে।

ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ঃ ব্যঞ্জনধ্বনির মাধ্যমে যেসব অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যেমন ঃ আজ, কাল, ধন ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে সংবৃত বা বদ্ধাক্ষর বা Closed Syllable বলে।

স্বরান্ত অক্ষরকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। ১. মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর ও ২. যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর।

মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর ঃ একটিমাত্র অযুক্ত স্বরধ্বনি নিয়ে বা শেষে থেকে যে অক্ষর গঠিত হয় তার নাম মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর। যেমন ঃ অ, আ, মা, বা ইত্যাদি।

যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর ঃ মৌলিক অক্ষরের শেষে যদি আরও উচ্চারিত স্বরধ্বনি থাকে এবং সব কটি ধ্বনিই যদি জিহ্বার অবিরাম গতি দ্বারা উচ্চারিত হয় তাহলে তাকে বলে যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। যেমন ঃ ঐ, ঔ, যাও ইত্যাদি।

মাত্রা ঃ অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।

যেমন ঃ কাকা = কা + কা = ১ + ১ = ২ মাত্রা।

মাত্রা গণনার বেলায় মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরকে সব সময় এক মাত্রায় ধরা হয়। যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের মাত্রা গণনায় কোন ছন্দে এক মাত্রার আবার কোন ছন্দে দু মাত্রার ধরা হয়।

মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরকে অযুগ্ম ধ্বনি এবং যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে যুগ্ম ধ্বনি বলা হয়। অযুগ্ম ধ্বনি সব ছন্দেই এক মাত্রার। আর যুগ্ম ধ্বনি কোথাও এক মাত্রার, কোথাও দু মাত্রার হয়ে থাকে।

মাত্রা চিহ্ন ঃ চিহ্ন দিয়ে মাত্রা নির্দেশ করার পদ্ধতি আছে।

অযুগ্ম ধ্বনির চিহ্ন ঃ ∪

যুগ্ম ধ্বনির চিহ্ন ঃ —

যেমন ঃ মঁনে পঁড়ে । জল, ফল ইত্যাদি।

যতি ও ছেদ ঃ যতি বা ছেদ বলতে উচ্চারণের বিরতি বোঝায়। কবিতা আবৃত্তি করার সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস থামাতে হয়। তাকে যতি বলে। অর্থের সঙ্গে মিল রেখে যেখানে থামতে হয় তার নাম ছেদ। কবিতায় জিহ্বার বিরাম স্থানের নাম যতি। যেমন ঃ

শুধু অকারণ। পুলকে ॥
ক্ষণিকের গান। গারে আজি প্রাণ। ক্ষণিক দিনের। আলোকে ॥

উদাহরণটিতে এক দাঁড়ি (।) দিয়ে যতি বোঝানো হয়েছে। যতি দুরকম ঃ অর্ধ যতি ও পূর্ণ যতি।

অর্ধ যতি এক দাঁড়ি (।) দিয়ে এবং পূর্ণযতি দুই দাঁড়ি (॥) দিয়ে বোঝানো হয়। অর্ধযতির স্থানে জিহ্বা একটু থামে, পূর্ণযতির জায়গায় সম্পূর্ণ থামে। যেমন ঃ

সকালে উঠিয়া আমি। মনে মনে বলি ॥
সারাদিন আমি যেন। ভাল হয়ে চলি ॥

ছেদ দু ভাগে বিভক্ত হতে পারে— ১. উপচ্ছেদ ও ২. পূর্ণচ্ছেদ।

কবিতার পংক্তিতে যেখানে বাক্যাংশের শেষ হয় সেখানে স্বল্পক্ষণের জন্য বিরতি উপচ্ছেদ এবং বাক্য যেখানে শেষ হয় সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বসে।

পর্ব ঃ কবিতার চরণে অর্ধযতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিসমষ্টিকে পর্ব বলে। আবৃত্তির সময় এক নিশ্বাসে পংক্তির যেটুকু উচ্চারিত হয় তার নাম পর্ব। এক যতি থেকে পরবর্তী যতি পর্যন্ত অংশটুকুই পর্ব। যেমন ঃ

ক. রূপশালী। ধান বুঝি। এই দেশে। সৃষ্টি ॥
ধূপছায়া। যার শাড়ি। তার হাসি। মিষ্টি ॥

খ. আমাদের ছোট নদী। চলে বাঁকে বাঁকে ॥
বৈশাখ মাসে তার। হাঁটু জল থাকে ॥

গ. দুর্গম গিরি। কান্তার মরু। দুস্তর পারা। বার
লঙ্ঘিতে হবে। রাত্রি নিশীথে। যাত্রীরা হুঁশি। য়ার।

এসব দৃষ্টান্তে দাঁড়ি (।) চিহ্ন দিয়ে পর্বভাগ দেখান হয়েছে।

পর্বাঙ্গ ঃ পর্বের ছোট ছোট অংশকে পর্বাঙ্গ বলে। যেমন ঃ

আমরা দুজনা। স্বর্গ ঃ খেলনা। গড়িব ঃ না ধর। নীতে।

এখনে বিসর্গ (ঃ) চিহ্ন দিয়ে পর্বাঙ্গ দেখান হয়েছে।

পংক্তি ঃ পংক্তি বলতে এক সারিতে সাজানো শব্দাবলি বোঝায়। এর অন্য নাম ছত্র, শ্রেণী, লাইন, সারি ইত্যাদি। পংক্তির উদাহরণ ঃ

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পংক্তি ছোট বড় হতে পারে। যেমন ঃ

আজি হতে শর্ত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে—
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

চরণ ঃ কবিতায় পূর্ণ যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্ণ ধ্বনি প্রবাহের বা ছন্দোবিভাগের নাম চরণ। কবিতায় এক একটি বাক্যই এক একটি চরণ বলে বিবেচিত হয়।

যেমন ঃ কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজরে সাজ।
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচকাওয়াজ।

—এখানে প্রতিটি পংক্তিই এক একটি চরণ। কবিতায় একটি চরণ যেমন এক পংক্তিতে গঠিত হতে পারে তেমনি চরণ ভেঙে একাধিক চরণে তা সাজানো চলে। যেমন ঃ

ভোর হল দোর খোল খুকুমণি ওঠরে।

—এখানে এক পংক্তিতে এক চরণ। আবার এভাবেও লেখা যায় ঃ

ভোর হল
দোর খোল
খুকুমণি ওঠরে।

এখানে পংক্তি তিনটি, কিন্তু চরণ একটিই।

পদ ঃ অর্ধযতি নির্দিষ্ট ছন্দবিভাগকে পদ বলে। যেমন ঃ দ্বিপদী, ত্রিপদী শ্রেণীর ছন্দ।

কষিত-কনক কান্তি | কমনীয় কায় ||
গালভরা গোঁফ দাঁড়ি | তপস্বীর প্রায় ||

এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে দুটি করে পদ রয়েছে। আবার পূর্ণ যতিবিশিষ্ট ছন্দবিভাগ বা পংক্তিকেও পদ বলে।

যেমন ঃ চতুর্দশপদী কবিতা। সেখানে একটি পংক্তি একটি পদ নামে আখ্যাত হয়।

স্তবক ঃ দুই বা তার বেশি চরণ সুশৃঙ্খলভাবে একত্রে সন্নিবিষ্ট হলে তাকে স্তবক বলে। স্তবক হল চরণগুচ্ছ। স্তবকে মিলের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। আবার স্তবকে একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ পায়। স্তবকের উদাহরণ ঃ

আবুবকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ীমুখে সারি গান—লা শরীক আল্লাহ।

স্বরাঘাত ঃ আবৃত্তির সময় কখনও কখনও কোন কোন শব্দের প্রথম অক্ষরে বিশেষ ঝোঁক পড়ে তাকে স্বরাঘাত বলে। এর অন্য নাম হল প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত। যেমন ঃ

থাকব নাক | বদ্ধ ঘরে | দেখব এবার | জগতটাকে।
কেমন করে | ঘুরছে মানুষ | যুগান্তরের | ঘূর্ণিপাকে ||

এখানে প্রত্যেক পর্বে প্রথমে অতিরিক্ত জোর দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। এই জোর দিয়ে বা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণকে স্বরাঘাত বলে।

মিত্রাক্ষর ঃ কবিতার পংক্তির শেষে যে মিল থাকে তাকে মিত্রাক্ষর বলে। প্রথম পংক্তির শেষ শব্দের সঙ্গে পরবর্তী পংক্তির শেষ শব্দের মিল থাকে। যেমন—

জল পড়ে
পাতা নড়ে।

গাছের ছায়ায় বনের লতায়
মোর শিশুকাল লুকায়েছে হায়।

কবিতার ছন্দে নানা ধরনের মিল দেওয়ার রীতি আছে। আবার কোন কোন ছন্দে পংক্তির শেষে মিল থাকে না।

ছন্দের লয় ঃ কবিতার ছন্দের বিশেষ বিশেষ লয় বা গতি বা চাল রয়েছে। কবিতা আবৃত্তির সময় এই লয় বা গতি ফুটে ওঠে।

বাংলা ছন্দে তিন রকম লয় আছে। যেমন ঃ

১. বিলম্বিত লয়
২. দ্রুত লয়
৩. ধীর লয়।

বাংলা তিন জাতের ছন্দে এই তিন শ্রেণীর লয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

১. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ বিলম্বিত লয়
২. স্বরবৃত্ত ছন্দ ঃ দ্রুত লয়
৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঃ ধীর লয়

বিলম্বিত লয় বলতে টেনে টেনে উচ্চারণ বোঝায়। দ্রুত লয় বলতে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ বোঝায়। আর ধীর লয় বলতে গম্ভীর উচ্চারণ বুঝিয়ে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের লয়ের উদাহরণ ঃ

১. **বিলম্বিত লয়ের ছন্দ ঃ**

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।

২. **দ্রুত লয়ের ছন্দ ঃ**

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।

৩. **ধীর লয়ের ছন্দ ঃ**

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী ?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে ?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে ?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে,
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্য ঘেরি।
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী ?

ছন্দ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত বিবিধ চিহ্ন

১. **মাত্রাচিহ্ন —**যুগ্মধ্বনির ওপর একটি সমান্তরাল ক্ষুদ্র রেখা [–] এবং অযুগ্মধ্বনির ওপর একটি অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন [◡]। যেমন ঃ

◡ –
গগন = গ + গন। গ—এক মাত্রা ; গন —কখনও একমাত্রা, কখনও দু মাত্রা।

একমাত্রা ধরলে গগন (◡ I), আর দু মাত্রা ধরলে গগন (◡ II)।

২. **অর্ধযতি বা যতির চিহ্ন** একটি লম্বা দাঁড়ি [।] এবং পূর্ণযতির চিহ্ন দুই লম্বা দাঁড়ি [॥]।

৩. **উপচ্ছেদ** একটি তারকা [*] চিহ্ন এবং পূর্ণচ্ছেদ দুটি তারকা [**] চিহ্ন।

৪. **পর্ব** যতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে যতির চিহ্নই পর্বের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ [।] ।

৫। **শ্বাসাঘাত চিহ্ন—**বর্ণের ওপরে রেফ [´] জাতীয় চিহ্ন।

৬। অপূর্ণ পর্বের উহ্য মাত্রাসংখ্যা শূন্য [০] চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়।

বিবিধ চিহ্ন সম্বলিত দৃষ্টান্ত ঃ

১। ´আজ মনে হয় । ´রোজ রাতে সে । ´ঘুম পাড়াত । ´নয়ন চুমে ॥

২। নীল নব ঘনে । আষাঢ় গগনে । তিল ঠাঁই আর । নাহিরে ০০০ ॥

৩। মরম না জানে । ধরম বাখানে ।
এমনে আছয়ে যারা ॥
কাজ নাই সখি । তাঁদের কথায় ।
বাহিরে রহুন তারা ॥

অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ ঃ
অক্ষর, মুক্তাক্ষর, বদ্ধাক্ষর, মাত্রা, যতি, পর্ব, চরণ, স্বরাঘাত, স্তবক।

২। যতি ও ছেদ কাকে বলে ? বাংলা ছন্দে যতি ও ছেদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন কর।

ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ২

বাংলা ছন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ

১. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

২. স্বরবৃত্ত ছন্দ

৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

ছন্দের শ্রেণী নির্ণয়ে নামের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। যেমন ঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে বলা হয় ধ্বনিপ্রধান, ধ্বনিমাত্রিক, বিস্তার প্রধান বা কলাবৃত্ত ছন্দ।

স্বরবৃত্ত ছন্দকে বলা হয় স্বরাঘাত প্রধান, শ্বাসাঘাত প্রধান, স্বরমাত্রিক, দলবৃত্ত ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, প্রাকৃত বা লৌকিক ছন্দ।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বলা হয় তানপ্রধান, অক্ষরমাত্রিক, মিশ্রপ্রাকৃতিক, সঙ্কোচপ্রধান, যৌগিক ছন্দ, মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ কবিতার যুগ্মধ্বনির মাত্রা গণনার হিসাবের ওপর নির্ভরশীল। অযুগ্মধ্বনি সব ধরনের ছন্দেই এক মাত্রা গণনা করা হয়। যুগ্মধ্বনি তিন জাতের ছন্দে তিনভাবে গণনা করা হয়ে থাকে। যুগ্মধ্বনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সব সময় দুই মাত্রার। স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্ম ধ্বনি সবসময় এক মাত্রার। আর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দের প্রথমে বা মাঝে হলে এক মাত্রার এবং শব্দের শেষে থাকলে দু মাত্রার বলে বিবেচিত হবে।

১. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব সময় দুই মাত্রা হিসেবে উচ্চারিত হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব সময় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয় এবং এতে যুগ্মধ্বনি দুই মাত্রার গণনা করা হয়। কখনও যুগ্মধ্বনি এক মাত্রা ধরা হয় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের লয় বা গতি বিলম্বিত অর্থাৎ এ ছন্দের কবিতা টেনে টেনে উচ্চারণ করতে হয়। পংক্তিতে পর্বগুলো সমান সংখ্যক মাত্রার হয়ে থাকে। তবে শেষ পর্ব অপূর্ণ থাকে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

ক. নতুন চরের পলি জমিটাতে কলাই বুনেছে যারা,
আখের খামারে দিতেছে তারাই রাতভর পাহারা।
ক্ষেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে পুঁতে শূন্যে বেঁধেছে ঘর,
বিচালী বিছায়ে রচেছে শয্যা বাঁশের বাখারি পর।

খ. আমরা চাহি না তরল স্বপন, হালকা সুখ,
আরাম কুশন, মখমল চটি, পানসে মুখ
শান্তির বাণী, জ্ঞান-বানিয়ার বই গুদাম,
ছেদো ছন্দের পলকা উর্ণা, সস্তা নাম।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যুগ্মধ্বনিকে দীর্ঘ বা দু মাত্রার ধরা হয়। এতে অক্ষরের দীর্ঘীকরণের প্রবণতা সাধারণত বেশি দেখা যায়। এ ছন্দের অন্তর্গত অক্ষরের প্রত্যেকটি ধ্বনিই স্পষ্টত উচ্চারিত হয়। এ ধরনের ধ্বনি বিস্তারের জন্য একে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলা হয়ে থাকে। এ ছন্দে ধ্বনিগুলোকে প্রয়োজনানুসারে প্রসারিত করে টেনে টেনে আবৃত্তি করা হয়। ধ্বনির এই বিস্তারের জন্য এ ছন্দকে বিস্তারপ্রধান ছন্দও বলা হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের লয় বা গতি বিলম্বিত। এ ছন্দের কবিতা বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে অর্থাৎ টেনে টেনে আবৃত্তি করতে হয়। বিশেষ শক্তি প্রয়োগ না করে এ ছন্দের কবিতা দুর্বল ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সাধারণত ললিতমধুর। ফলে 'উচ্ছল গীতিস্পন্দিত কবিতা' রচনায় এ ছন্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

২. স্বরবৃত্ত ছন্দ

যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব সময় একমাত্রা গণনা করা হয় তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক পর্বের প্রথমে স্বরাঘাত পড়ে। একে ছড়ার ছন্দও বলা হয়।

স্বরবৃত্ত ছন্দে পর্বে মাত্রার সংখ্যা সাধারণত চারটি করে হয়ে থাকে এবং সব পর্ব সমান মাত্রার হয়। পংক্তির শেষ পর্ব অপূর্ণ থাকতে পারে। স্বরবৃত্ত ছন্দ মাত্রাবৃত্তের সম্পূর্ণ বিপরীত ছন্দ। এই ছন্দের লয় বা গতি দ্রুত।

স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

ক. নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে
ওপারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।

খ. মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রি কালে
ঐ যে আমার নেয়ে
ঝড় বয়েছে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য

স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি সব সময় একমাত্রার। এতে যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট বা ঠেশে উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং বদ্ধাক্ষর ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর অন্যান্য অযুগ্মধ্বনির মত একমাত্রার পরিগণিত হয়। এ জাতীয় ছন্দের কবিতার প্রত্যেক পর্বের প্রথমে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। শ্বাসাঘাত ও যুগ্মধ্বনির প্রভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিতরঙ্গের প্রকাশ ঘটে। প্রত্যেক পর্বে সাধারণত চার মাত্রা থাকে। শেষ পর্ব.ছাড়া অন্যান্য পর্বে মাত্রাসংখ্যার সমতা থাকে।

এ ছন্দে কথ্যরীতির ক্রিয়াপদই বেশি ব্যবহৃত হয়। তাই এতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি বজায় থাকে। এ ছন্দের লয় বা গতি দ্রুত। দ্রুত তালে উচ্চারণেই এর ঝঙ্কার ফুটে ওঠে। এ ছন্দে ছড়া ও লোকসাহিত্যের কিছু কিছু সৃষ্টি রূপায়িত হয়ে উঠেছে বলে একে ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দও বলা হয়। এ ছন্দ বাংলার বনেদী ছন্দ।

হাল্‌কা বিষয়বস্তুই এ ছন্দে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দের মাঝে হলে একমাত্রার এবং শব্দের শেষে হলে দুই মাত্রার হিসেবে গণনা করা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লয় বা গতি ধীর। সাধারণত গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা এই ছন্দে রচিত হয়। ছন্দের গঠনগত বৈচিত্র্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্য এই ছন্দ বিশেষ সহায়ক।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত

ক. মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

খ. মুমতাজ তাজ নহে বেদনার মূর্তি
শিল্প-সৃষ্টি-আনন্দের অকুণ্ঠিত স্ফূর্তি।
আঁখিতে সুর্মারেখা অধরে তাম্বুল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে স্তাম্বুল,
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন শ্রেণী

পয়ার ঃ পয়ারের প্রতি চরণে দুটি করে পর্ব থাকে। চরণে মাত্রাবিন্যাস ৮+৬ =১৪ মাত্রা। পয়ারের শেষে মিল থাকে। যেমন ঃ

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

ত্রিপদী ঃ ত্রিপদী ছন্দে প্রত্যেক চরণে তিনটি করে পর্ব থাকে। পর্বের মাত্রাবিন্যাস ৬ + ৬ + ৮ = ২০ মাত্রা। অন্ত্যমিল থাকে। যেমন ঃ

যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।

চৌপদী ঃ চৌপদী ছন্দের প্রতি চরণে চারটি করে পদ থাকে। এতে অন্ত্যমিল থাকে। যেমন ঃ

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ার ছন্দভিত্তিক, কিন্তু এতে পংক্তির শেষের মিল নেই। এই ছন্দে এক পংক্তিতে বক্তব্য শেষ না হয়ে অন্য পংক্তিতে ছড়িয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যকে প্রবহমানতা বলে। প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট পর্ব বিভাগ নেই। বড় ধরনের ভাব প্রকাশে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিশেষ সহায়ক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই ছন্দের প্রবর্তন করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দৃষ্টান্ত

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা বণে পুনঃ বক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

মুক্তক ছন্দ ঃ ছেদ অনুসারে পর্বগঠন, অন্ত্যানুপ্রাস, প্রবহমানতা, অর্থবিভাগভিত্তিক পংক্তি সৃষ্টি নিয়ে যে ছন্দ তাকে মুক্তক ছন্দ বলে। এই ছন্দে পংক্তি শেষে মিল থাকে, তবে পংক্তিগুলো সমান সংখ্যক মাত্রার নয়। আর থাকে প্রবহমানতা।

মুক্তক ছন্দের দৃষ্টান্ত

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

প্রবহমান পয়ার ঃ চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তির পয়ারের মধ্যে প্রবহমানতা আনলে তাকে প্রবহমান পয়ার ছন্দ বলে। এতে পংক্তিতে মাত্রা সংখ্যা থাকে চৌদ্দটি, অন্ত্যমিল থাকে, আর থাকে প্রবহমানতা। একটি দৃষ্টান্ত ঃ

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্বরাগ অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কুলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে —একি শুধু দেবতার !

গদ্য ছন্দ ঃ গদ্যছন্দে অন্ত্যমিল থাকে না। পংক্তিগুলো সমান নয়। এতে ছেদবিচ্ছিন্ন চরণ গঠিত হয়। গদ্য ছন্দে যতি, মিত্রাক্ষর, অনুপ্রাসযমক ইত্যাদি পরিহার করা হয়। গদ্যের ভঙ্গিতে তা পড়তে হয়।

গদ্যছন্দের দৃষ্টান্ত

আমার পূর্ববাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দপ্রান্তিক হলে দু মাত্রার এবং শব্দের মাঝে বা প্রথমাংশে থাকলে সাধারণত এক মাত্রার ধরা হয়। অযুগ্মধ্বনি অন্যান্য ছন্দের মত একমাত্রা হিসেবেই গণ্য। এ ছন্দে অক্ষর উচ্চারণের ধ্বনি আচ্ছন্ন করে একটি অতিরিক্ত তান বা সুরের তরঙ্গ রূপ লাভ করে। তাই তা তানপ্রধান ছন্দ নামেও পরিচিত। যুগ্মধ্বনির সঙ্কোচন প্রসারণ এ ছন্দের মত অন্য কোন ছন্দে নেই। অক্ষরের এ স্থিতিস্থাপকতা এ ছন্দের বিশেষত্ব। যুক্ত ব্যঞ্জনের গুরুভার বহনের ক্ষমতা এ ছন্দের অত্যন্ত বেশি। ফলে যুক্তাক্ষরবিহীন বা যুক্তাক্ষরবহুল সব রকম চরণই এ ছন্দে সৃষ্টি করা চলে। এতে 'জয়জয়ন্তীর উচ্চ গম্ভীর ধ্বনি এবং পূরবী সাহানার মৃদু করুণ সুর' সহজেই রূপায়িত হয়ে ওঠে। যুক্তাক্ষরের বাহুল্যের জন্য এ ছন্দে ধ্বনিগাম্ভীর্য সহজে প্রকাশ পায়।

এ ছন্দের লয় বা গতি ধীর। মন্থর গতিবেগের জন্য এতে গানের সুর আসে। গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশের জন্য এ ছন্দ খুবই উপযোগী। এ ছন্দে যতির অধীনতা থেকে ছেদকে মুক্ত রাখা যায়। ফলে এতে প্রবহমানতা আসে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব দীর্ঘ হয়। ছয়, আট ও দশ মাত্রার পর্বই এখানে বেশি। এই ছন্দ অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানা প্রকৃতির ছন্দ এর অন্তর্গত। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, অমিত্রাক্ষর, গৈরিশ, প্রবহমান পয়ার, মুক্তক, গদ্যছন্দ প্রভৃতি অক্ষরবৃত্তের বিভিন্ন রূপ।

অনুশীলনী

১। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।
২। স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।
৩। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।
৪। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আকৃতিগত পার্থক্য উদাহরণসহযোগে বিশ্লেষণ কর।
৫। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কাকে বলে ? এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
৬। বাংলা ছন্দ কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকার ছন্দের বৈশিষ্ট্য উদাহরণের সাহায্যে দেখাও।

ছন্দ বিশ্লেষণ ৩

ছন্দের বিশ্লেষণকালে নিম্নলিখিত দিকগুলো দেখতে হয় ঃ

১। ছন্দের নাম

২। ছন্দের লয় ও গতি

৩। চরণে বা পংক্তিতে পর্ব বিন্যাস

৪। পর্বে মাত্রাবিন্যাস

৫। স্তবকে চরণ সংখ্যা

ছন্দ বিশ্লেষণের নমুনা ঃ

১।

‖⏑⏑⏑ ‖⏑ ⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ‖⏑⏑
পঞ্চশরে। দগ্ধ করে। করেছ একী। সন্ন্যাসী,।

‖⏑‖ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑⏑
বিশ্বময়। দিয়েছ তারে। ছড়ায়ে ॥

⏑⏑⏑‖ ⏑⏑⏑ ‖ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ‖⏑⏑
ব্যাকুলতর। বেদনা তার। বাতাসে উঠে। নিশ্বাসি'॥

‖⏑ ‖ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑⏑
অশ্রু তার। আকাশে পড়ে। গড়ায়ে ॥

⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑‖ ⏑⏑ ⏑⏑⏑‖ ‖⏑⏑
ভরিয়া উঠে। নিখিল তব। রতি-বিলাপ। সংগীতে।

⏑‖ ‖ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑⏑
সকল দিক। কাঁদিয়া উঠে। আপনি ।॥

⏑‖ ⏑⏑ ⏑‖ ⏑⏑ ⏑⏑⏑ ‖ ‖⏑⏑
ফাগুন মাসে। নিমেষ মাঝে। না জানি কার। ইঙ্গিতে ।

⏑⏑⏑ ⏑⏑ ‖⏑ ⏑⏑ ⏑⏑⏑
শিহরি উঠি। মুরছি পড়ে। অবনী ।॥

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। বিলম্বিত লয়। সমগ্র স্তবকটিতে চারটি চরণ—চরণে দুটি করে পংক্তি। প্রতি চরণে সাতটি করে পর্ব। পর্বে মাত্রার সংখ্যা পাঁচ। কিন্তু প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম পংক্তিতে শেষ পর্ব চার মাত্রার এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম পংক্তির শেষ পর্ব তিন মাত্রার। সমমাত্রিক চরণ। অন্ত্যমিল আছে।

২। ⏑⏑ ⏑⏑⏑॥⏑ ॥⏑॥⏑ ⏑⏑⏑॥⏑ ⏑⏑॥
আমি । বসুধাবক্ষে । আগ্নেয়াদ্রি । বাড়ব-বহ্নি । কালানল ॥

⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑ ॥⏑ ⏑॥ ⏑⏑॥ ⏑⏑ ⏑⏑॥
আমি । পাতালে মাতাল । অগ্নি পাথার । কলরোল কল । কোলাহল ॥

⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑ ॥ ⏑⏑ ⏑⏑ ⏑⏑ ॥⏑
আমি । তরীতে চড়িয়া । উড়ে চলি জোর । তুড়ি দিয়া দিয়া । লম্ফ ॥

⏑⏑ ॥ ॥⏑⏑ ⏑⏑⏑ ⏑⏑⏑ ॥⏑⏑ ⏑⏑ ॥⏑
আমি । ত্রাস সঞ্চারি । ভুবনে সহসা । সঞ্চারি ভূমি । কম্প ॥

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। বিলম্বিত লয়। পাঁচ পর্বের চরণ। প্রত্যেক পংক্তির প্রথমে দুই মাত্রার অতিপর্ব। প্রথম দু পংক্তির শেষ পর্ব চার মাত্রার এবং শেষ দু পংক্তির শেষ পর্ব তিন মাত্রার। আন্যান্য পর্ব ছয় মাত্রার। স্তবকটি চার চরণে গঠিত। পর পর দুই পংক্তিতে অন্ত্যমিল আছে।

৩। ⏑॥ ⏑⏑⏑ ॥ ॥ ॥ ॥⏑ ॥⏑ ⏑⏑
রানার ছুটেছে । তাই ঝুম ঝুম । ঘণ্টা বাজছে । রাতে ॥

⏑॥ ⏑⏑⏑ ⏑⏑॥ ⏑⏑ ⏑⏑
রানার চলেছে । খবরের বোঝা । হাতে ॥

⏑॥ ⏑⏑⏑ ⏑॥
রানার চলেছে । রানার ॥

॥॥ ⏑⏑ ⏑⏑⏑⏑ ⏑⏑ ⏑॥ ⏑⏑⏑ ⏑।
রাত্রির পথে । পথে চলে কোনো । নিষেধ জানেনা । মানার ॥

॥ ⏑⏑⏑ ⏑ ⏑॥ ⏑॥ ⏑॥
কাজ নিয়েছে সে । নতুন খবর । আনার ॥

মাত্রাবৃত্ত শ্রেণীর ছন্দ। পাঁচটি পংক্তির এই স্তবকে প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে চারটি করে পর্ব এবং দ্বিতীয় ও পঞ্চম পংক্তিতে তিনটি করে পর্ব। তৃতীয় পংক্তিতে দুই পর্ব। পর্বগুলো ছয় মাত্রার, তবে সব পংক্তির শেষ পর্ব অপূর্ণ—প্রথম দুই পংক্তির শেষ পর্ব দুই মাত্রার এবং শেষের তিন পংক্তির শেষ পর্ব তিন মাত্রার। অন্ত্যমিলে বৈচিত্র্য আছে। এই ছন্দের লয় বিলম্বিত হয়।

⏑⏑ ⏑। ⏑⏑ ⏑। ⏑⏑
৪। ওরে নবীন । ওরে আমার । কাঁচা ।

⏑⏑ ⏑। ⏑⏑ ⏑।
ওরে সবুজ । ওরে অবুঝ ।

। ⏑⏑। ⏑ ⏑⏑ । ⏑⏑
আধ-মরাদের । ঘা মেরে তুই । বাঁচা ॥

।⏑ ⏑। ⏑⏑ ⏑। ⏑⏑
রক্ত আলোর । মদে মাতাল । ভোরে ।

। ⏑ ⏑ ⏑ ⏑⏑ ⏑। ⏑⏑
আজকে যে যা । বলে বলুক । তোরে,

↓I I↓ ↓I I↓ ↓↓
সকল তর্ক। হেলায় তুচ্ছ। করে।

I↓↓ I I↓ ↓↓ ↓↓
পুচ্ছটি তোর। উচ্চে তুলে। নাচা ॥

I ↓I↓ I↓ ↓I ↓↓
আয় দুরন্ত। আয়রে আমার কাঁচা॥

স্বরবৃত্ত ছন্দ। দ্রুত লয়। চার মাত্রার পর্ব। শেষ পর্ব অপূর্ণ এবং দুই মাত্রার। চরণের সংখ্যা তিনটি। অসমপর্বিক চরণ। বিশেষ রীতিতে অন্ত্যমিল দেওয়া হয়েছে।

৫। I ↓ ↓I I ↓ ↓I ↓I ↓↓ I↓I
আজকে তোমায়। দেখতে এলাম। জগৎ আলো। নূরজাহান!

I↓ ↓I I↓I I ↓I ↓I I↓I
সন্ধ্যা রাতের। অন্ধকার আজ। জোনাক পোকায়। স্পন্দমান।

I↓ ↓↓ I↓ ↓I ↓↓↓I ↓I I
বাংলা থেকে। দেখতে এলাম। মরুভূমির। গোলাপ ফুল,

↓I ↓I ↓I↓↓ I ↓ ↓ I I ↓I
ইরান দেশের। শকুন্তলা। কই সে তোমার। রূপ অতুল?

স্বরবৃত্ত ছন্দ। চার মাত্রার পর্ব। প্রত্যেক পংক্তিতে চারটি করে পর্ব আছে। শেষ পর্ব অপূর্ণ ও ৩ মাত্রায়। এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ হিসেবেও বিবেচ্য। সমপর্বিক চরণ। প্রত্যেক পর্বের প্রথমে শ্বাসাঘাত পড়বে। এ ছন্দের লয় দ্রুত।

৬। II↓ ↓↓↓ I↓ ↓ ↓II II
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি,। সে আমার নয়।॥

↓I↓ I II ↓↓ ↓↓I↓II
অসংখ্য বন্ধন মাঝে। মহানন্দময়।

↓↓↓ I II II II ↓↓II
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার।

I↓II I↓↓↓ ↓↓ ↓I II
মৃত্তিকার পাত্রখানি। ভরি বারম্বার।

↓II ↓↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓↓
তোমার অমৃত ঢালি। দিবে অবিরত।

↓↓ I↓ I↓II
নানা বর্ণ গন্ধময়।॥

অক্ষরবৃত্ত শ্রেণীর প্রবহমান পয়ার ছন্দ। ধীর লয়। স্তবকটিতে তিনটি চরণ, ছয়টি পংক্তি। প্রত্যেক পংক্তিতে দুটি করে পর্ব, শেষ পংক্তিতে একটি পর্ব। পংক্তির পর্ববিন্যাস ৮+৬ =১৪ মাত্রা, শেষ পংক্তি ৮ মাত্রার। প্রবহমানতা আছে। পর পর দুই পংক্তিতে অন্ত্যমিল।

৭। ⏑ II   I ⏑   II ⏑   II   I ⏑   I ⏑
আমার পূর্ব বাংলা। এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ। ৮+৬

I ⏑ ⏑ II   ⏑ II
অন্ধকারের তমাল। ৮

⏑ II   ⏑ ⏑ ⏑   ⏑ I ⏑ II
অনেক প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায়। ১১

II ⏑   ⏑ ⏑ ⏑   ⏑ I ⏑
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ। ৯

I II   I ⏑ II   ⏑ ⏑
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো। ৯

⏑ ⏑ ⏑ II   ⏑ ⏑ II   ⏑ ⏑
সরোবরের অতলের মতো। ১১

⏑ ⏑   II   ⏑ II   I ⏑ II   ⏑ ⏑
কালো কেশ মেঘের। সঞ্চয়ের মতো ৭+৬

⏑ I ⏑   ⏑ ⏑ II   I ⏑
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি ॥ ৯

অক্ষরবৃত্ত শ্রেণীর গদ্যছন্দ। অংশটিতে আটটি পংক্তি। পংক্তির পর্বসংখ্যা সমান নয়, পর্বে মাত্রা সংখ্যাও সমান নয়। মাত্রা বিন্যাস ঃ প্রথম পংক্তি ৮+৬=১৪, দ্বিতীয় পংক্তি ৮, তৃতীয় পংক্তি ১১, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তি ৯টি করে, ষষ্ঠ পংক্তি ১১, সপ্তম পংক্তি ৭+৬=১৩ এবং অষ্টম পংক্তি ৯ মাত্রার।

ছন্দের গতি ধীর।

অনুশীলনী

ছন্দ বিশ্লেষণ কর ঃ

১। অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে !
প্রিয়সখীর নামগুলো সব ছন্দ ভরি করিত রব
রেবার কূলে কলহংস কলধ্বনির মতো।

২। শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে-ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলকে,
মর্মর তানে ভরে ওঠে গানে শুধু অকারণ পুলকে।

৩। অমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি
আমি পথসম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য পাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

৪। বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরলো তারে,
ঔষধে ডাক্তারে,
ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়ো,
নানা মাপের জমলো শিশি, নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলো যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, "হাওয়া বদল করো।"

৫। তাই—
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই
যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে
দিয়েছে তা ধূলিরে ফিরায়ে।

অলঙ্কার ৪

অলঙ্কার বলতে সাহিত্যের ভিতরের ও বাইরের সাজ-সজ্জা বোঝায়। অলম শব্দটির এক অর্থ 'ভূষণ'। 'ভূষণ' করা হয় যা দিয়ে তাকে বলে অলঙ্কার। সাহিত্যে অলঙ্কার বলতে উপমা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণগুলো বুঝিয়ে থাকে। সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত উপমা, অনুপ্রাস, রূপক ইত্যাদি সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেসব উপকরণ সংযোজিত হয় তার নাম অলঙ্কার। সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত এক চমৎকাবিত্বের সৃষ্টিই হল অলঙ্কার।

তাই অলঙ্কাবের সংজ্ঞা এভাবে নির্দেশ করা যায় ঃ অনুপ্রাস, উপমা ইত্যাদি যেসব লক্ষণ সাহিত্যসৃষ্টির সৌন্দর্য সম্পাদন ও উৎকর্ষ ঘটায় তাকে অলঙ্কাব বলে।

সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অলঙ্কাবহীন বাক্যও সুন্দর হতে পারে। কিন্তু অলঙ্কার যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হলে সাহিত্যেব সৌন্দর্য অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। মনোভাবকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অলঙ্কার প্রয়োগ করতে হয়। রসহীন বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অলঙ্কাব বিশেষভাবে সাহায্য করে। যথাস্থানে যথোচিতভাবে অলঙ্কাব প্রয়োগ করা হলে সাহিত্যসৃষ্টি যথার্থই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

শব্দের দুটি দিক ঃ ১. ধ্বনি ও ২. অর্থ। ধ্বনিকে অবলম্বন করে যেমন অলঙ্কার প্রয়োগ, তেমনি অর্থ অবলম্বন করেও অলঙ্কারের ব্যবহার হয়ে থাকে। কানে শোনার জন্য ধ্বনি, আর মনে উপলব্ধি করার জন্য অর্থ। তাই অলঙ্কার প্রয়োগের ব্যাপারে ধ্বনি ও অর্থের গুরুত্ব সমান বলে বিবেচিত হয়।

ভাষার অলঙ্কার তার শব্দের ওপর নির্ভরশীল, শব্দের আছে দুটো দিক—বাইরের উচ্চারণে সে ধ্বনি, আর ভিতরে সে অর্থময়। অর্থাৎ বাইরে তাব ধ্বনি— যা শোনা যায়। আর অন্তরে তার অর্থ— যা বোঝা যায়।

শব্দের এই বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে অলঙ্কারকে ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে দু ভাগে ভাগ করা যায়। তাই অলঙ্কাব দুই ধবনেব ঃ ১. শব্দালঙ্কার ও ২. অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার

শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে।

শব্দ হল মূর্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসংকেত। শব্দেব বহিবঙ্গের যে ধ্বনি তার ওপরই শব্দালঙ্কারের ভিত্তি। শব্দের উচ্চারণ ঘটে ধ্বনির সাহায্যে, সে ধ্বনিকে কেন্দ্র কবে যে অলঙ্কার রূপায়িত হয়ে ওঠে তার নামই শব্দালঙ্কার। ধ্বনিকে অবলম্বন করেই শব্দালঙ্কারের সকল কারুকাজ। শব্দালঙ্কার প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিব অলঙ্কার। ধ্বনি আবার বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি, কোথাওবা বাক্যধ্বনি হয়ে থাকে। বর্ণধ্বনি রূপ লাভ করে অনুপ্রাসে, পদের ধ্বনি রূপ লাভ করে যমক, বক্রোক্তি ও শ্লেষে এবং বাক্য ধ্বনি প্রকাশ পায় যমকে।

শব্দালঙ্কার নানা ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান হল ঃ অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি।

অনুপ্রাস

একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের বারবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। যেমন ঃ

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা।

একই বাক্যে অদূরবর্তী বিভিন্ন শব্দে একটি বা একাধিক বর্ণের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি হলে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে তার নাম অনুপ্রাস অলঙ্কার। যেমন ঃ

ক. আমি অজর অমর অক্ষয় আমি অব্যয়।
খ. অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার।
গ. এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।

অনুপ্রাস নানা ধরনের হয় ঃ

১. সরল অনুপ্রাস ঃ একটি বা দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে সরল অনুপ্রাস হয়ে থাকে। যেমন ঃ

ক. কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।
খ. কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুবভি।
গ. হাহাকার করে বেহায়া হাওয়ায় বেহালাখানি।

২. গুচ্ছানুপ্রাস ঃ ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছ বা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একই ক্রমে অনেকবার ধ্বনিত হলে গুচ্ছানুপ্রাস হয়। যেমন ঃ

ক. না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত।
খ. ভূলোক দ্যুলোক গোলক ছাড়িয়া।
গ. তুমি সুগন্ধ হেনার গন্ধ অন্ধ কুঁড়ির মাঝে
বন্ধ হইয়া ছিলে মূক বেদনায়।

৩. অন্ত্যানুপ্রাস ঃ কবিতার এক চরণেব শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে অন্য চরণের শেষে তার পুনরাবৃত্তি হলে তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে। কবিতার চরণের শেষে যে মিল তার নাম অন্ত্যানুপ্রাস। যেমন ঃ

ক. সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।
খ. নীড় নেই কোন পালাবার
চলো হিমাচলে চলো যাই দূরে মালাবার।
গ. আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।

৪. ছেকানুপ্রাস ঃ একই বর্ণগুচ্ছ যদি একইক্রমে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে দুবার ধ্বনিত হয় তবে তাকে ছেকানুপ্রাস বলে। যেমন ঃ

ক. ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

খ. আর এক ফল আছে নাম আনারস
নন্দন কানন থেকে বুঝি আনা রস।

গ. যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।

৫. বৃত্তানুপ্রাস ঃ যদি একটি ব্যঞ্জনবর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা বর্ণগুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার ধ্বনিত হয় তবে তাকে বৃত্তানুপ্রাস বলে। যেমন ঃ

ক. কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।

খ. ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ভেদিয়া।

৬. মালানুপ্রাস ঃ অনুপ্রাসের মালা অর্থাৎ একাধিক অনুপ্রাস থাকলে তাকে মালানুপ্রাস বলে। যেমন ঃ

ক. আজন্ম সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনালতা।

খ. কুসুমকুন্তলা মহী মুক্তামালা গলে।

যমক

একই শব্দ একই স্বরধ্বনিসমেত একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হলে তাকে যমক অলঙ্কার বলে। যমক শব্দের অর্থ যুগ্ম। এতে একই শব্দ বা প্রায় এক রকমের উচ্চার্থ শব্দ দু বার বা বেশি বার উচ্চারিত হয়। শব্দের অর্থও আলাদা হতে হবে। যেমন ঃ

ক. মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস রাতি রহিলে আমি বন্ধ।

খ. হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়
হরিকে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়।

গ. আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।

শ্লেষ

একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে। যেমন ঃ

ক. কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

—এখানে সমগ্র বাক্যের দুটি অর্থ। এক অর্থে ঈশ্বর চরাচরে ব্যাপ্ত, তাঁর আলোকে সূর্য আলোকিত হয়। অন্য অর্থে যাঁর প্রতিভায় প্রভাকর পত্রিকা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় সেই ঈশ্বর গুপ্তকে অখ্যাতনাম কে বলবে ? তাঁর খ্যাতি চরাচরে ব্যাপ্ত। — এটা শ্লেষ অলঙ্কার।

খ. আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে ॥

— এখানে 'গুণে' অর্থ (১) ধনুকের ছিলায়, (২) স্বভাবের উৎকর্ষে।

গ. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥

বক্রোক্তি

রচনার সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বক্রতা বা মনোহর ভঙ্গি দ্বারা উক্তি সম্পন্ন হলে তাকে বক্রোক্তি অলঙ্কার বলে।

সোজাভাবে না বলে বাঁকাভাবে কোন বক্তব্য প্রকাশ পেলে তা হয় বক্রোক্তি। যেমন ঃ

গৌরীসেনের আবার টাকার অভাব কি।—এখানে টাকার অভাব নেই ভাবটি বাঁকা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

বক্রোক্তি দুই ধরনের— ১. শ্লেষ বক্রোক্তি ও ২. কাকু বক্রোক্তি।

১. শ্লেষ বক্রোক্তি ঃ বক্তার বক্তব্যকে তার অভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হলে তাকে শ্লেষ বক্রোক্তি বলে। যেমন ঃ

ক. সভা কবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড় টানাটানি।
নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন দুঃখে।
'অর্থ' শব্দের বক্তার অভিপ্রেত অর্থ—অতিধেয়, তাৎপর্য ;
প্রতিবক্তার অভিপ্রেত অর্থ—টাকাকড়ি।

খ. প্রশ্ন—দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন ?
উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

২. কাকু বক্রোক্তি ঃ যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থ এবং ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে কাকু বক্রোক্তি বলে। যেমন ঃ

ক. রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?

খ. অতীতের চির অন্ত অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তি পথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?

গ. আজি শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ।

অর্থালঙ্কার

শব্দের অর্থের ওপর নির্ভর করে যেসব অলঙ্কারের সৃষ্টি সেগুলোকে অর্থালঙ্কার বলে। শব্দের ধ্বনি নয়, কেবল অর্থের আশ্রয়ে প্রকাশিত সৌন্দর্যই অর্থালঙ্কার হিসেবে বিবেচিত।

অর্থালঙ্কার সাধারণ লক্ষণ অনুসারে প্রধানত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। যেমন ঃ ১। সাদৃশ্যমূলক, ২। বিরোধমূলক, ৩। শৃঙ্খলামূলক, ৪। ন্যায়মূলক ও ৫। গূঢ়ার্থমূলক।

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার ঃ দুই ভিন্ন জাতীয় পদার্থের অন্তর্নিহিত কোন না কোন সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে যে শ্রেণীর অলঙ্কার রূপ লাভ করে তাকে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার বলে। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার হল ঃ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান, সমাসোক্তি ও প্রতীপ।

উপমা ঃ একই বাক্যে সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট দুই ভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হলে তাকে উপমা বলে। যেমন ঃ

ক. পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি।

খ. বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মত।

উপমার চারটি অঙ্গ ঃ

১. উপমেয় ঃ যাকে তুলনা করা হয়।
২. উপমান ঃ যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।
৩. সাধারণ ধর্ম ঃ যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তুলনা দেওয়া হয়।
৪. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ঃ মত, সম, হেন, সদৃশ, প্রায় ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত ঃ 'পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি।'—এ বাক্যে উপমেয়—মুষ্টি, উপমান—পদ্মের কলিকা, সাধারণ ধর্ম—ক্ষুদ্র, সাদৃশ্যমূলক শব্দ—সম।

পূর্ণোপমা ঃ যেখানে উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে পূর্ণোপমা বলে। যেমন ঃ

ক. রাজ্য তব স্বপ্নসম
গেছে ছুটে।

খ. তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।

লুপ্তোপমা ঃ উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে যে কোন একটি বা দুটির উল্লেখ না থাকলে তা লুপ্তোপমা হয়। যেমন ঃ

ক. পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন।

খ. মধুর মত, দুধের মত, মদের মত সুখে গেয়েছিলাম গান।

মালোপমা ঃ একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকলে তাকে মালোপমা বলে। যেমন ঃ

ক. তোমার সে চুল
জড়ানো সূতার মত, নিশীথের মেঘের মতন।

খ. উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের মত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

রূপক ঃ উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে রূপক অলঙ্কার বলে। যেমন ঃ

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নামনৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তব আগে কি ছার যমুনা।

রূপক তিন জাতের।

ক. নিরঙ্গ রূপক ঃ যখন একটি উপমেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয় তখন তা হয় নিরঙ্গ রূপক। যেমন ঃ

ক. এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

খ. তুমি অন্তব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত শয়নে
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চির যামিনী।

খ. সাঙ্গ রূপক ঃ যেখানে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমেয়ের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয় সেখানে সাঙ্গ রূপক হয়। যেমন ঃ

ক. ধারামঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে
রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি।

খ. শোকের ঝড় বহিল সভাতে,
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার ; জীমূতমন্ত্র হাহাকার রব।

৩. পরম্পরিত রূপক ঃ যদি একটি উপমেয়ের সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়ের সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদ কল্পনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তরে পরম্পরিত রূপক হয়। যেমন ঃ

ক. মরণের কুলে বড় হয়ে ফোটে
জীবনের উদ্যানে।

খ. সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র বিস্মৃতি কীট কাটে।

উৎপ্রেক্ষা ঃ নিকট-সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।

খ. হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক।

গ. পাতলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুবে
দেবশিশুদের কাগজেব নৌকা।

সন্দেহ ঃ যেখানে উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষে সমান সংশয় থাকে সেখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ? কে করে শোচনা
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত লোচনা।

খ. নাবীর মুখে আমি কি দেখিলাম
নয়ন মাঝে অশ্রু টলমল ? কিংবা কমল শিশির ঝলমল ?
চলিতে পথে চমকি দাঁড়ালাম।

অপহ্নুতি ঃ যদি উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তবে তাকে অপহ্নুতি বলে। যেমন ঃ

ক. নারী নহ, কাব্য তুমি, তোমা পরে কবির প্রসাদ
কবির কল্পনা মোহে চক্ষে তব ঘনায়েছে ঘোর।

খ. এ তো মালা নয়গো, এ যে তোমার তরবারি।

নিশ্চয় ঃ যদি উপমানকে নিষিদ্ধ করে উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহলে তাকে নিশ্চয় অলঙ্কার বলে। যেমন ঃ

ক. এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।

খ. নমি সেই মানবীবে—
দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা।

ভ্রান্তিমান ঃ অতি সাদৃশবশত উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের প্রভেদ নির্ণয় করতে না পেরে যদি উপমেয়কে উপমান বলে ভুল করা হয়, তবে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

তোমার সুখে গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো
কমল বলে ভুল করে সে
স্পর্শ ছড়ালো ;
আমার ঈর্ষা জাগালো।

অতিশয়োক্তি ঃ উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনার জন্য উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ করে উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. হায় শূর্পণখা
কি কুক্ষণে দেখিছিলি তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা
এ ভূজগে।

খ. আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।

ব্যতিরেক ঃ উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সূচিত হলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

ক. কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাগে
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে কৌরবে।

খ. কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা ?
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।

প্রতীপ ঃ প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয় রূপে বর্ণনা করলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।

খ. প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ-কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

সমাসোক্তি ঃ অচেতন উপমেয়ে চেতন উপমানের কিংবা চেতন উপমেয়ে অচেতন উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
আয় আয কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

খ. বিজন বনের বুকের ব্যথা,
তরুলতার মনের কথা,
তপ্ত হাওয়ার হাই লেগে হয় পাতায় পাতায় কানাকানি।

প্রতিবস্তুপমা ঃ যেখানে উপমেয় ও উপমান দুটি পৃথক বাক্যে থাকে, তাদের সাধারণ ধর্ম তাৎপর্যে এক হয়েও বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় না, সেখানে প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা ? অগ্নিশিখা তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-দল-বলে।

দৃষ্টান্ত ঃ যেখানে উপমেয় ও উপমান দুটি পৃথক বাক্যে থাকে, তাদেব সাধারণ ধর্ম তাৎপর্যে এক না হয়েও সদৃশ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় না, সেখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?

নিদর্শনা ঃ যেখানে দুটি বস্তুর অসম্ভব বা সম্ভব সম্বন্ধ ব্যঞ্জনা দ্বারা উপমেয় উপমান ভাব ফুটিয়ে তোলে, সেখানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

যেমন ঃ

অমরবৃন্দ যার ভূজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী,
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?

বিরোধমূলক অলঙ্কার

দুটি পদার্থের আপত বিরোধকে অবলম্বন করে যে শ্রেণীর অলঙ্কার রূপ লাভ করে তাকে বিরোধমূলক অলঙ্কার বলে। এর আছে নানা শ্রেণী।

বিরোধাভাস ঃ যেখানে দুটি বিষয়ের মধ্যে আপাত বিরোধ আছে, প্রকৃত বিরোধ নেই, সেখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।

খ. এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

বিভাবনা ঃ যেখানে প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়াই কার্যের উৎপত্তি হয়, সেখানে বিভাবনা অলঙ্কার হয়ে থাকে। যেমন ঃ

ক. বদন থাকিতে না পারে বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।

খ. শ্রম বিনা ক্ষীণ বটি, ভয় বিনা নয়ন চঞ্চল,
অভূষণে শোভে দেহ, এ যে নবযৌবনের ফল।

বিশেষোক্তি ঃ যেখানে প্রসিদ্ধ কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি হয় না, সেখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

অসঙ্গতি ঃ এক স্থানে কারণ থাকলে এবং অপর স্থানে কার্যোৎপত্তি হলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

বারেক তাকাই যদি তব মুখপানে
পৃথিবী টলিয়া ওঠে।

বিষম ঃ কারণ ও কার্যের বৈষম্য দেখা দিলে কিংবা বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ হলে বিষম অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সে তো তোমার আলো।

খ. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

শৃঙ্খলামূলক ঃ বাক্যাংশের যোজন-শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে যে শ্রেণীর অলঙ্কার রূপলাভ করে, তাকে শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার বলে। এর কিছু শ্রেণীবিভাগ আছে ঃ

কারণমালা ঃ কোন কারণের কার্য যদি পরবর্তী কার্যের কারণ হয়ে পড়ে এবং এভাবে কার্য-কারণ পরম্পরা চলতে থাকে, তবে কারণমালা অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি।

একাবলী ঃ যেখানে পূর্ববর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ পদ পরবর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষ্য পদ রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে একাবলী অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল।

সার ঃ যেখানে পদার্থের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হয়, সেখানে সার অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

সংসার ভিতর সার, যে বস্তু চেতন।
চেতনের মধ্যে সার, মনুষ্য রতন।।
মনুষ্যের সার সেই, বিদ্যা আছে যার।
পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে বিনয়ীই সার।

ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার ঃ যেখানে কোন বক্তব্যকে ন্যায়সঙ্গত সমর্থনসহ উপস্থিত করা হয় তাকে ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার বলে।

এই অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ হল অর্থান্তরন্যাস ও কাব্যলিঙ্গ।

অর্থান্তরন্যাস ঃ যেখানে সাধারণ বিষয়ের দ্বারা বিশেষ বিষয় অথবা বিশেষ বিষয়ের দ্বারা সাধারণ বিষয় সমর্থিত হয় সেখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি, ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

খ. কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।

কাব্যলিঙ্গ ঃ যেখানে কোন পদের বা বাক্যের অর্থকে ব্যঞ্জনায় বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ বলে মনে হয়, সেখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?

গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার ঃ যেখানে প্রস্তাবিত বাচ্যার্থের আড়ালে আরেকটি গূঢ়ার্থ থাকে তাকে গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার দু' ধরনের— ১. ব্যজস্তুতি ও ২. অপ্রস্তুত প্রশংসা।

ব্যজস্তুতি ঃ স্তুতিচ্ছলে নিন্দা অথবা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বোঝালে ব্যজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যেমন ঃ

ক. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ

খ. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।

অপ্রস্তুত প্রশংসা ঃ যেখানে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হয়, সেখানে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার রূপলাভ করে।

যেমন ঃ

ক. প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম-গোত্র-হীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই।

খ. আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলোর সংজ্ঞা নির্দেশ কর ঃ উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, মালোপমা, বিরোধ, অপহ্নুতি, স্বভাবোক্তি, নিদর্শনা।

২। যে কোন তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উদাহরণ দাও ঃ উল্লেখ, বক্রোক্তি, বিশেষোক্তি, সমাসোক্তি, বিষম।

৩। উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলঙ্কারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ঃ বিরোধাভাস, অসঙ্গতি, ব্যজস্তুতি, যমক, শ্লেষ।

৪। অনুপ্রাস ও যমকের সংজ্ঞা ও পার্থক্য কি ? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৫। দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস— এ দুটি অলঙ্কারের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৬। অলঙ্কার নির্ণয় কর ঃ

ক. খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তন্যপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে। (পূর্ণোপমা)

খ. যৌবন বসন্ত সম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃবসন্তের হয় আগমন
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন। (ব্যতিরেক)

গ. তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, যেতে নাহি দিব। (সমাসোক্তি)

ঘ. বৃথাই হল জন্ম রে তোর
সব হল তোর মিছে,
সারা জীবন ছুটলি শুধুই
মরীচিকার পিছে। (অতিশয়োক্তি)

ঙ. নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে একজামিনের পড়ায়
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন দিকে যে গড়ায়
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা। (বিরোধাভাস)

———